Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৩৩ তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৮ই পৌষ, ১৪২৯ / 24.12.2022

- সম্পাদক -

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
ভক্ত বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রী প্রণব ঘোষ
এশিয়ার নবজাগরণে বৌদ্ধভাবনা	ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর
পওহারী বাবার অলৌকিকত্ব	ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য
রোগান্তর কল্পে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

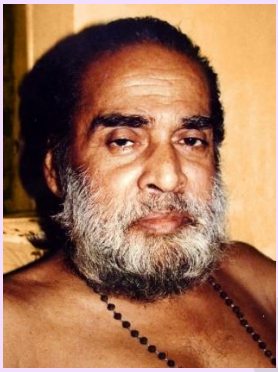

(১০.০৩.১৯২৬ - ২৪.১১.১৯৮৬)

- প্রীতি কণা -

"জীবনে গীতার মাধ্যমে যোগ সাধনার প্রথম দীক্ষা পিতৃদেবের কাছে। তিনিই এই সংসার-জীবন সংগ্রামে সারথি ছিলেন ও আছেন। যোগের মূল যে শিক্ষা – তাঁর কাছেই পাই। জীবনের সকল বাধা বিঘ্নের যে বৈতরণী – তা পার হতে পেরেছি তাঁরই কৃপায়। তারপর জীবনের নানা ধাপে পেয়েছি এক একজন সাধক ও মহাপুরুষের সান্নিধ্য, সাহচর্য ও কৃপা। অনিলবরন দিয়েছেন গীতা প্রচারের প্রেরনা, ধর্ম প্রচারের সহায়তা, অফুরন্ত স্নেহ ও কৃপা। তাছাড়া জীবনে শত শত লোকের সংস্পর্শ এনে দিয়েছে বিমল আনন্দ ও সুখ। প্রতিটি জীবনের স্পর্শই আমার হৃদয়ের একটি আফোটা ফুলকে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। তেমনি প্রতিটি জীবনের স্পর্শ অনেক বেশি করে আমার চৈত্য পুরুষকে জাগ্রত করেছে, নিয়ে গিয়েছে অধ্যাত্ম জীবনের আরো গভীরে। তাই প্রতিদিনেই, প্রতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করেছি সেই পরম পুরুষের সান্নিধ্য, উপস্থিতি ও স্পর্শ। কখনও কখনও তিনি আমাকে পূর্ণভাবে এই সংসার থেকে পৃথক করে নিয়েছেন – তিনি আমাকে একাত্মভাবে চান বলে। সংসারের সমস্ত কিছু থেকে অনেক ঊর্ধে তুলে ধরেছেন, তাঁর কাজ পূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য।"

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

নির্বাচন পর্ব শেষ হয়ে গেল (১৯৮৯)। গত ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শ্রীপ্রীতিকুমার ভোট দিয়েছিলেন। অসম্ভব সচেতনতা ছিল। ভোটের আগের দিন থেকেই কি ভীষণ একটা উত্তেজনা কাজ করত। পায়চারী করতেন, ঘন ঘন চা খেতেন, আর যাদের রাজনৈতিক মতবাদ পছন্দ ছিল না, তাঁদের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতেন বেশ উচ্চ স্বরে।

আমরা এই বাড়িতে আসার পরেই ইন্দিরা গান্ধী নিহত হন। তারপর আসে নির্বাচনের পালা। সকাল থেকে হাঁকডাক। "চল ভোটটা দিয়ে আসি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আবার ভোটটা কেউ দিয়ে দেবে।" আমি মোটামুটি সব কাজ শেষ না করে বাড়ি থেকে বেরোই না। তাই আমার একটু দেরিই হয়। খুব ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে যেতে হয়। শেষের দিকে আমাকে বাদ দিয়ে একেবারেই বেরোতে চাইতেন না। কারণটা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনা। এটা কি তাঁর নির্ভরশীলতা? এটা কি আমাকে স্বাবলম্বী করে তোলা? কি জানি .....!

বরানগরে যখন শ্রী জ্যোতি বসু দাঁড়াতেন তখন আমরা ঐ constituency -তে বাস করতাম। যতদূর মনে আছে, সে সময়ে লোকসভায় শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী দাঁড়াতেন। প্রতীক চিহ্ন ছিল "কাস্তে ধানের শীষ"। অন্য প্রার্থীদের নাম আমার সঠিক স্মরণে নেই। যাইহোক ঐ যুগে মনে হয় কম্যুনিষ্ট বলতে কাস্তে ধানের শীষ প্রতীক চিহ্নই বোঝাতো। শ্রীমতী রেনু চক্রবর্তী ছিলেন মহিলা, আবার বিধান রায়ের ভাইঝি। আমার খুব পছন্দ ছিল তাঁকে। আমি মনে মনে তাঁকে পছন্দ কোরতাম। শ্রীপ্রীতিকুমার আমাকে কিভাবে ভোট দিতে হয় শেখাতেন। কোথায় ছাপ দেব, কিভাবে ব্যালট পেপার ভাঁজ করব ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে বলে যেতেন অমুককে ভোট দিও। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলে উঠতাম - "এইবার কিন্তু আমি complain করব, আমাকে প্রভাবিত করা

হচ্ছে।” খুব মজা করতেন। ফিরে আসবার পরই জিজ্ঞেস করতেন – “কাকে ভোট দিলে? অমুককে দিয়েছো তো?” আমি জবাব না দিলেই তাঁর ধারণা হতো একটা ভোট নষ্ট করে দেশের চরম ক্ষতি করে ফেলেছি। আমার দ্বারা দেশের আর কোনও উন্নতি সম্ভব নয়। আমাকে একেবারে শিশু মনে করতেন। কোনও কাজের আগে চলত দশবার সতর্ক করে দেবার পালা। কাজের পর চলত বিশবার সমালোচনা। ফলে আমি ভীষণ নির্ভরশীল হয়ে গেছিলাম। আমি কোথাও একা যেতে পারিনা, আমি ক্ষিদে পেলেও একা দোকানে বসে খেতে পারি না। আমি কোনও জিনিষপত্র একা কিনতে পারিনা, একা cinema দেখতে পারি না। তখন তিনি ঠিক আমার assistant যোগাড় করে দিতেন। “তোমার বৌদির সঙ্গে একটু ওখানে ঘুরে এসো তো!” ইত্যাদি .....। সকলে সে দায় মাথা পেতে নিতেনই।

ভোটপর্বের একটি ছোট ঘটনা বলে এ প্রসঙ্গে ইতি টানি। সেবার মনে হয় বরানগরে শ্রী শিবপদ ভট্টাচার্য ও শ্রী জ্যোতি বসু বিধানসভার প্রার্থী হয়েছিলেন। রিগিং হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। আমরা ভোট দিতে যাবো কি যাবোনা সেটা স্থির করে উঠতে পারছিলাম না। আমি একদল মহিলার সঙ্গে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। বরানগরে ঐ ভোট কেন্দ্রে শুরু হোল গণ্ডগোল। পার্টির লোকেরা মোটামুটি “দাদা, বেরিয়ে যান” – বলে সবাইকে বের করে দিয়েছে। শ্রীপ্রীতিকুমার আর বাড়ি আসেন না। আমরা চিন্তা করে মরে যাচ্ছি, কি হল, কি হল! প্রায় ঘন্টাখানেক পরে ঢুকলেন। মুখ দেখে মনে হল যেন বিশ্ব জয় করে ফিরলেন। আনন্দে মুখ জ্বলজ্বল করছে। বললেন – “সবাইকে বের করে দিল। আমি গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নড়লাম না। বললাম, ভোট না দিয়ে আমি যাব না। আমার ভোট আমি দেবই।” কোনও একটি ছেলের নাম করে বললেন, “শেষ পর্যন্ত ও এগিয়ে এসে বললো, মেসোমসাই, এবার আপনি আসুন। তারপর আমি গিয়ে আমার ভোট দিয়ে এলাম –”। সে যে কি আনন্দ হয়েছিল তাঁর সেদিন, তা’ ভোলবার নয়।

DO NOT COPY

অসম্ভব গোঁ ছিলো। পিছু পা হতেন না কোনও কাজে। আমার তো সব সময় 'গেলো, গেলো' ভাব। সেসব একেবারেই নস্যাৎ করে দিতেন। শেষের দিকে পুত্রের সঙ্গে এককাট্টা হয়ে আমাকে জব্দ করবার যে কতরকম প্রচেষ্টা ছিল, তা বলবার নয়। আমি একেবারেই পাত্তা দিতাম না। আমার প্রাধান্য এ বাড়িতে খণ্ডিত হবার নয়। কারণ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব একা হাতে করবার অভ্যাস আছে আমার। বাড়িসুদ্ধ সবাই ওঠবার আগেই আমার সংসারের অর্ধেক কাজ হয়ে যেত। মজা হত চা করবার সময়ে। স্নান না করে আমি উনুনে কেটলী চাপাতাম না। তিনি চোখ খুলেই চায়ের প্রত্যাশা করতেন। ফলে সংস্কারবশতঃ মাথায় জল ঢেলেই ভিজে কাপড়েই চা করতে হোত। এখনও করি, তবে স্নানের পর জামাকাপড় বদলাবার সময় পাই। তবু গাফিলতি করিনা ...।

২৫শে নভেম্বর শ্মশান থেকে আসতে বেলা ১২টা বেজে গেলো। সেদিন চায়ের ব্যাপারটা কারো খেয়ালে ছিল না। মাত্র ১০-১২ ঘন্টা সময়ে আমার মনে হয়েছিল ভদ্রলোক সত্যি চলে গেলেন বোধহয়। ২৬শে নভেম্বরে ভোরে মনে হল আমার গায়ে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে - "চা দেবে না? চা দাও।" -- চোখ খুলে খাটটির দিকে তাকিয়ে দেখি শুয়ে আছেন কাত হয়ে। কারো সাথে কোনও কথা না বলে বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল ঢেলেই রান্নাঘরে ছুটলাম চা করতে। সেই চা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি। তারপর আর ভুল হয়নি। রেগে হোক, ক্ষোভে হোক, ভক্তিতে হোক, ভালবাসায় হোক, কর্তব্যে ত্রুটি করিনি। এখন বিশ্বাস করি আত্মা অবিনশ্বর। এখন বিশ্বাস করি, ভগবান বলে একটি অস্তিত্ব আছে। এখন বিশ্বাস করি আমি একজন মহাপুরুষের ঘরণী ছিলাম। তিনি দেহে আবদ্ধ নন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। একটা কথা ঠিক - দেহে আবদ্ধ সেই প্রীতিকুমার আমার নিজস্ব সম্পত্তি ছিলেন না। এখন তিনি আমার একান্ত নিজের। এখন আমি তাঁকে অনেক বেশী ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, নিজেকে সমর্পণ করতে পারি। তবু মাঝে মাঝে মনটা ভারী হয়ে জায়। আহা! যদি ঐ টাটকা পার্শে মাছগুলি কাঁটা বেছে খাইয়ে দিতাম! যদি একটু পা টিপে দিতাম! যদি মাদ্রাজে চোখের জন্য নিয়ে যেতে পারতাম! আর কিছুদিন থাকলে তাঁকে শঙ্কর নেত্রালয়ে

নিয়ে যাওয়া যেতো। নীরেনদা তো প্রস্তুত হচ্ছিলেনই। হোল না। সবার কি সব কিছু হয়? .....

গত অগ্রহায়ণ মাসে পারিজাতদার লেখা পড়ে অনেক কথা মনে পড়ে গেলো। এ'কথাগুলি ঐ সময়ে শ্রীপ্রীতিকুমার এসেই বলেছিলেন বাড়িতে। আমি তখন বিশ্বাস করতাম না। এখন বিশ্বাস করি পারিজাতদা যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার কারণ তাঁকে কেউ কোনও ব্যাঘাত ঘটায়নি। এ প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কথা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন কেন আমার লেখায় এত জ্বালা যন্ত্রনা ফুটে বেরোয়।

এ বছরের (১৯৮৯ সনের) দুর্গাপূজো গেলো। বাপী শ্যামবাজার যায় মাঝে মাঝে। ওকে না জিজ্ঞেস করে আমি ওখানে যাই না।

এবার পূজার সময় বাপীর সাথে আমার একটু মনোমালিন্য চলছিল। আমি অমরনাথ দর্শন করে আসবার পর থেকেই ও সব ব্যাপারে অসহযোগ প্রকাশ করে যাচ্ছিল। আমিও ক্ষুণ্ণ হবার মহিলা নই। আমার কাজ আমি করে যাচ্ছিলাম। বাপী যথারীতি সন্দেশ প্রসাদ নিয়ে আসছিল, আমি গ্রহণ করছিলাম না। আমার তখন মনে হচ্ছিলো – ও আবার একটা পুজো দেয়? সেই আবার প্রসাদ? খাব না। আমি ওর মা। ওর পুজো করা প্রসাদে আমার দরকার নেই। সবচেয়ে মজা হল প্রতিদিনই সন্দেশ আমি খাচ্ছি না। অথচ পুজো দেওয়া আপেল নিয়মিত খেয়ে যাচ্ছি। ঁবিজয়া দশমীর দিন শ্যামবাজারের জন্য ভীষণ মন কেমন করছিল। একা যাওয়া অভ্যেস নেই। মীরা, মনু, সোমা, সকলে গেলাম গঙ্গাস্নান করতে। ঐ পথে শ্যামবাজার যাওয়া ঠিক হল। Taxi দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকেছি। প্রথমে আমি ঢুকলাম প্রণাম করতে। শ্রীপ্রীতিকুমারের আসনে মাথা ঠেকিয়ে গড় করতেই হঠাৎ ঘরটি আলো আলো হয়ে গেলো। সে যে কি জ্যোতি চিন্তা করা যায়না। আসনের মাঝখানে শ্রীপ্রীতিকুমারের মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এবার বোধহয় কিছু একটা প্রাপ্তি ঘটবে। হঠাৎ পাশে একটা 'ফোঁস ফোঁস' আওয়াজ। আমি চমকিত। তবে কি শ্রীপ্রীতিকুমার নিঃশ্বাস নিচ্ছেন? (আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমার একেবারেই জ্ঞান নেই।) উত্তেজনায়

চোখ খুলেই দেখি আমার পাশে উপুড় হয়ে রয়েছে মনু। অবাক হয়ে গেলাম। হায়রে! এদের নিয়ে শ্রীপ্রীতিকুমার এত বছর কাটিয়েছেন? আমরা কখনও একজন প্রণাম করতে ঘরে ঢুকলে অন্যজন ঢুকি না। এ বাড়িতেও সেটি মেনে চলা হয়। একজন বেরিয়ে এলে অন্যজন ঢোকেন। হঠাৎ ঐ দিনই ঐ সময়ে মনুর আমার সঙ্গে বিশেষ করে শ্যামবাজারের ঐ ঘরে ঢোকার কারণ আমার কাছে অজ্ঞাত। প্রথমে একটু রাগ হয়েছিল। পরে ভাবলাম আমিই তো ওকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছি। আমার হয়ত ওর চেয়ে বেশী দর্শন ভাগ্যে ছিল না। মনুর উপর রাগ করে কি হবে? তবু মনটা এখনও দুঃখে ভরে আছে ঐ ঘটনাটার জন্য। প্রত্যেক মানুষই তো তার সংস্কার নিয়ে জন্মায়। আমার সংস্কারের জন্যই হয়ত এর বেশী এগোতে পারছি না। এই হচ্ছে ঘটনা। আমরা প্রায় প্রতিদিনই এরকম আকস্মিকতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। সেগুলো মনে পড়ে, তাই লিখে ফেলি। এটা কারো উপর রাগ বা ক্ষোভ নয়, এটা প্রকৃত ঘটনা। আসলে ব্যাপারটা হল আমরা সাধারণ মানুষেরা নিজেদের সমস্যা, সুখ, দুঃখ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি অন্যের জীবনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না। আমাদের ব্যবহারে অনেকে দুঃখ পাচ্ছেন, কিন্তু ব্যাপারটা হল আমার যেখানে ক্ষত, সেখানে যন্ত্রণা আমার। রামের কিম্বা শ্যামের নয়। তাই তারা ভাবে আমি ক্ষোভ প্রকাশ করছি কেন? আসলে শ্রীপ্রীতিকুমার আমার স্বামী, প্রিয়জন, শ্রদ্ধেয়। তাঁকে যে আঘাত করে সে আমার চরম শত্রু। আমার দাদাকে যে অপমান করবে সে আমার শত্রু। আমার দেওরকে যে অসম্মান করবে সে আমার বিরাগভাজন। আমার সাথে তাঁদের সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন আমার পরিবারের সদস্যের প্রতি বাইরের লোকের অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করবার শিক্ষা আমি পাই নি। শ্রীপ্রীতিকুমার নিজেই বলে গেছিলেন, “Murder একজনই করে, কিন্তু সঙ্গে যারা আসে তারাও Murderer।” তিনি যাদের ক্ষমা করে যেতে পারেন নি, আমি কোন ‘তথাগত’ যে তাদের জন্য ভদ্রতার মুখোশ পরে থাকব?

– – – – – – – – – – – – – –

(** রচনাকাল – জানুয়ারি, ১৯৯০)

মথুর নাথ বিশ্বাস

রাণী রাসমণির জামাতা মথুরনাথ ঠাকুরের প্রধান রসদদার ছিলেন। ঠাকুরের দেহধারণের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, সাধন ভজনের জন্য যা কিছু দরকার এমন কি তীর্থ পর্যটন, সাধ আহ্লাদ সব কিছু মথুরবাবু সানন্দে সাগ্রহে পূরণ করতেন। ঠাকুরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মনের সুখে সেবা করতেন, সোনা ও রুপার বাসনে খেতে দিতেন, মূল্যবান বস্ত্র বা হাজার টাকা দামের শাল পরিয়ে আনন্দ পেতেন। ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণের জন্যে তিনি গরিবদের খাইয়েছেন, কাপড় দান করেছেন, দক্ষিণেশ্বরে আগত সাধু সন্ন্যাসীদের থাকা ও সিধার ব্যবস্থা করেছেন। আরও যে কত কি করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু শুধু মথুরের অকৃপণ সেবার কথা উল্লেখ করলেই সমগ্র চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত হয় না। ঠাকুরেরও মথুরের উপর অপার কৃপা ছিল। তিনি সর্বদা মথুর ও তাঁর পরিজনবর্গের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখতেন। বস্তুত উভয়ের মধ্যে ভক্তি বিশ্বাস প্রেম-প্রীতির এক মধুর সম্পর্ক ছিল যার তুলনা বিরল।

মথুর ইংরেজী শিক্ষিত ছিলেন, হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। তার ফলে তিনি যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। যুক্তিবাদ খারাপ নয়, বরং ভালই বলা চলে। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠার আধিক্য মানুষের ঈশ্বরীয় ভাবের বিকাশকে রুদ্ধ করে। ঈশ্বর অনন্ত শক্তি, অনন্ত তাঁর লীলা, যুক্তি দিয়ে কি তার ইয়ত্তা করা যায়! একদিন মথুর মন্তব্য করেছিলেন, “ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই।” ঠাকুর সে কথা না মেনে নিয়ে বলেছিলেন, “ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনই তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটি আইন করতে পারে। মথুর সে কথা মানতে পারেন নি, বলেছিলেন, “লাল ফুলের গাছে

লাল ফুলই হয় সাদা ফুল হয় না, কেন না তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি।" পরের দিনই ঠাকুর মথুরের এই ভুল ভেঙ্গে দেন। একটা লাল জবা ফুলের গাছে একই ডালে দুটি ফুল-একটি সাদা, অপরটি লাল দেখে তিনি ডালশুদ্ধ ফুল দুটি এনে মথুরের কাছে হাজির করলেন। মথুর স্বীকার করলেন, "হ্যাঁ, বাবা, আমার হার হয়েছে।" হ্যাঁ, এই হারটুকুই দরকার ছিল যাতে তিনি ঈশ্বরের অনন্তলীলা আস্বাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় ভক্তি বিশ্বাস লাভ করেন। ঠাকুর তাঁর সেই প্রয়োজন পূর্ণ করেছিলেন।

ঠাকুর কে, কি তাঁর স্বরূপ তা কারো বোঝার উপায় ছিল না। ঠাকুর কৃপা করে তা কাউকে বুঝিয়ে দিলে তিনি বুঝতে পারতেন। মথুরবাবু ঠাকুরের সেই কৃপা পেয়েছিলেন। একদিন ঠাকুর তাঁর ঘরের উত্তর পূর্ব কোণে লম্বা বারান্দায় পায়চারি করেছিলেন, আর মথুরবাবু কুঠির একটি ঘরে বসে ঠাকুরকেও লক্ষ্য করছিলেন। হঠাৎ তিনি দৌড়ে এসে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ, আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও - আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যখন পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রথম ভাবলুম চোখের ভুল; চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম দেখি তাই। এরূপ যতবার করলুম, দেখলুম তাই।" এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে বলেছিলেন, "মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল, বাপু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপা দৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

ঠাকুর সত্যিই একবার মৃত্যুদন্ড থেকে মথুরকে রক্ষা করেছিলেন। জমিদারি সংক্রান্ত একটি দাঙ্গাহাঙ্গামায় তিনি নরহত্যার কারণ হন। এরপর মামলায় আদালতের রায়ে তাঁর প্রাণণ্ডের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় তিনি ঠাকুরের কাছে এসে অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করে বলেন, "বাবা, রক্ষা কর।

ঠাকুর এতে চটে যান এবং ভর্ৎসনা করে মথুরকে বলেন, “তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে এসে বলবি, ‘রক্ষা কর’–আমি কি করতে পারি? যা, নিজে বুঝগে যা–আমি কী জানি?” তারপর মথুরের কাতরতা দেখে মন নরম হলে বলেন, “যা মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।” এতে বিপদ কেটে যায় এবং মথুরের প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে বিশেষ সম্মানলাভ ঘটে।

অন্যান্য বিপদ আপদ থেকেও ঠাকুর মথুর এবং তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করতেন। একবার মথুরের স্ত্রী জগদম্বার সাংঘাতিক অসুখ হয়। ডাক্তার বৈদ্যরা জবাব দিয়ে যায়। এই বিপদে মথুর চোখে অন্ধকার দেখতে থাকেন। তিনি যে শুধু প্রিয়তম পত্নীকেই হারাতে বসেছিলেন, তা নয়, সেই সঙ্গে শুধু শাশুড়িমাতার বিষয়ের উপরও তাঁর আধিপত্য বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়। তখন মথুর চোখের জলে অতি দীনভাবে ঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন, “আমার যা হবার তা তো হতে চলল, বাবা, তোমার সেবাধিকার থেকেও এবার বঞ্চিত হলাম। তোমার সেবা আর করতে পারব না।” মথুরের এই কাতরতায় ঠাকুরের অন্তর করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি মথুরকে অভয় দিয়ে বললেন, “ভয় নেই, তোমার পত্নী আরোগ্য লাভ করবে। আর কি আশ্চর্য! মথুর দক্ষিণেশ্বর থেকে জানবাজারের বাড়িতে পৌঁছে দেখেন তাঁর পত্নীর অবস্থা অনেক ভালো। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পরে বলেছিলেন, “সেই দিন থেকে জগদম্বা ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগল এবং তার ঐ রোগটার ভোগ (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই শরীরের উপর দিয়ে হতে থাকল। জগদম্বা দাসীকে ভাল করে ছয় মাস কাল পেটের রোগ ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছিল।”

ঠাকুর কতভাবেই যে মথুর ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। মথুরবাবু তাঁকে নানা উপলক্ষ্যে জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে যেতেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ে একত্রে আহারাদি করতেন, এমন কি এক শয্যায় শয়ন করতেন। ঠাকুরও বাপ-মায়ের কাছে ছোট ছেলেটির মতো তাঁদের পাশে শুয়ে থাকতেন। এই সৌভাগ্য অপর কারো হয়েছে বলে জানা যায় না।

মথুরবাবু ছিলেন কোপন-স্বভাব এবং হঠকারী। কখন কি করে বসেন তার ঠিক ছিল না। অনেক সময় তাঁকে সামলাবার ভার ঠাকুরকেই নিতে হত। একবার জানবাজারে শারদীয়া দুর্গাপুজার দশমীর দিনে মথুরবাবু স্থির করেন তিনি মাকে বিসর্জন দেবেন না। তখন তাঁর এমনই ভক্তি বিহ্বল অবস্থা যে মার বিসর্জনের কথা মনে হলেও যেন তাঁর প্রাণ কেমন করে ওঠে। এদিকে পুরুত ঠাকুর বিসর্জনের জন্যে বার বার তাগাদা দিচ্ছেন। এতে মথুর গরম হয়ে উঠলেন। তিনি বলে উঠলেন, "আমি মাকে বিসর্জন দিতে দেব না, আমি মা'র নিত্য পূজা করব। আমার অনিচ্ছায় কেউ বিসর্জন দিলে মহা বিভ্রাট হবে। খুনোখুনি পর্যন্ত হতে পারে। ক্রুদ্ধ হলে মথুরবাবুর দিগ্‌বিদিগ জ্ঞান থাকত না। তাই কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না। মথুর-গৃহিনীর আবদারে ঠাকুরকেই শেষ পর্যন্ত অবস্থা সামাল দিতে এগিয়ে আসতে হল।

ঠাকুর গিয়ে দেখেন মথুরের মুখ ও চোখ রক্তাভ। তিনি উন্মনা হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। ঠাকুরকে দেখেই মথুর তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলেনঃ বাবা, যে যাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকতে বিসর্জন দিতে পারব না। বলে দিয়েছি নিত্য পূজা করব। মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব?

ঠাকুর তখন তাঁর বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বললেনঃ ও, এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বললে? বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? মা কি কখনও ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারে? এ তিনদিন বাইরের দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েছেন; আজ থেকে তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন। এই কথায় মথুরের হৃদয় মন্দির অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হলেন।

মথুরবাবু ঠাকুরের কাছ থেকে কেবল জাগতিক সুখশান্তির জন্য আশীর্বাদ নিয়েই ক্ষান্ত হননি, আধ্যাত্মিক অনুভূতিও প্রার্থনা করেছিলেন। ঠাকুরের কাছে যে সব ভক্তরা আসতেন তঁদের অনেকেরই ভাবসমাধি হত। তাই তিনি ঠাকুরকে ধরে বসলেন, "বাবা, আমার যাতে ভাব সমাধি হয়, তা তোমার করে দিতে

DO NOT COPY

হবে।” ঠাকুর বললেন, “ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো বেশ আছিস–এদিক ওদিক দুদিক চলছে। ওসব হলে এদিক থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়–আশয় সব রক্ষা করবে কে? বারোভূতে সব যে লুটে খাবে। তখন কি করবি?

ঠাকুর বুঝালে কি হবে? মথুরবাবু তো বুঝতে চান না। তিনি ভাব সমাধির জন্যে আবদার করেই চললেন। ঠাকুর তাঁকে নিবৃত্ত করতে না পেরে বললেন, “তা কি জানি বাপু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।”

এর কয়েকদিনের মধ্যেই মথুরবাবুর ভাবসমাধি হয়। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলেছিলেন, “আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়, চক্ষু লাল, জল পড়ছে, ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আর বুক থর থর করে কাঁপছে। আমাকে দেখে একেবারে পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললে, “বাবা, ঘাট হয়েছে! আজ তিনদিন ধরে এই রকম, বিষয় কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না। সবখানে খারাপ হয়ে গেল।” তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমি চাইনে। তখন ঠাকুর হেসে হেসে তাঁকে বলেছিলেন, “তোকে তো একথা আগেই বলেছি।” মথুরবাবু সে কথা স্বীকার করে বললেন, “হ্যাঁ, বাবা, কিন্তু তখন কি অতশত জানি যে, ভূতের মতো এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমায় চব্বিশ ঘন্টা ফিরতে হবে? ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারবো না?” এ কথার পর ঠাকুর তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং মথুরবাবুরও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো।

ঠাকুর ও মথুরের মধ্যে সম্পর্কটি ছিল বড়ই মধুর। মথুর যেমন ঠাকুরকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করে আনন্দ পেতেন, তেমনি ঠাকুরও মথুরকে পরম আত্মীয় বলে জ্ঞান করতেন। তাঁর কাছে নিজের কোন সাধ আহ্লাদের কথা বলতেও দ্বিধা করতেন না, এমন কি জোর পর্যন্ত করতেন। বৈদ্যনাথ দর্শনে গিয়ে পল্লীর স্ত্রীপুরুষদের দুর্দশা দেখে ঠাকুরের মন করুণায় ভরে ওঠে। তিনি মথুরকে বলেন, “তুমি মা’র দেওয়ান। এদের একমাথা করে তেল, একখানা

করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।" তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে আগেই এতগুলো টাকা ব্যয় করলে পাছে শেষে টাকার টানাটানি হয় তাই তিনি প্রথমে একটু ইতঃস্তত করছিলেন। তাতে ঠাকুর রাগ করে বললেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" বালকস্বভাব ঠাকুরের এই গোঁ দেখে মথুর কলকাতা থেকে কাপড় আনিয়ে ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণ করেন। তখন ঠাকুরেরও কত আনন্দ! মথুরের সঙ্গে তাঁর জমিদারি মহলে ভ্রমণ করতে গিয়ে সেখানেও ঠাকুর দরিদ্র অধিবাসীদের একমাথা তেল, একখানা নতুন কাপড় ও পেটপুরে একদিনের ভোজন দান করতে অনুরোধ করেছিলেন। মথুর ঠাকুরের সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। মথুর কিন্তু তাই বলে দানশীল বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না বরং তিনি স্বভাবত কৃপণই ছিলেন। ঠাকুরের কৃপায়, তাঁর সঙ্গগুণে তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হয়ে যায়। কাশীতে গিয়ে তিনি 'কল্পতরু'র মতো দান করেছিলেন। দেবসেবার মতো সাধুসেবার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে তাঁর কোন কার্পণ্য ছিল না। সাধুদের জন্যে বস্ত্র, কম্বল, কমন্ডলুতে কালীবাড়ির একটা ঘর ভর্তি ছিল। মথুর নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠাকুরের আদেশে ঐ সব দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হবে। অন্নমেরু ব্রত অনুষ্ঠানের সময় তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাজার মন চাল, হাজার মন তিল ও বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা দান করেছিলেন। রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ও যাত্রায় যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদেরও মুক্ত হস্তে পারিতোষিক দেওয়া হয়। এরকম আরো কত দানধ্যানের জন্যে মথুর স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মথুর জানতেন ঠাকুরই তাঁর বল ভরসা। ঠাকুরও সে দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন। একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি মথুরকে বলেন, "মথুর, তুমি যতদিন আছ, আমি ততদিন এখানে থাকব।" সে কথা শুনে মথুরের ভয় হয়। তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলেন, "সে কি বাবা, আমার স্ত্রী ও পুত্র দ্বারকাও যে তোমায় বিশেষ ভক্তি করে।" মথুরের এই কাতর ভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, "আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারী যতদিন থাকবে, আমি ততদিন থাকব।" ঠাকুর সে আশ্বাস পূর্ণ করেছিলেন।

মথুর জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। অন্তিম মুহূর্তে তাঁকে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঠাকুর সশরীরে সেখানে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু তিন ঘন্টা ধ্যান নিমগ্ন থেকে দিব্য শরীরে ভক্তের পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন। ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে উঠালেন; তার তেজ শ্রীশ্রী দেবীলোকে গেল।"

দুর্গাচরণ নাগ

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' গ্রন্থের সঙ্কলক সুরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে সাধু নাগমশাই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের ঠাকুর পঞ্চবটীতে ধ্যান করতে পাঠাতেন। নাগমশাই ও সুরেশচন্দ্রকে ঠাকুর সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। ধ্যান শেষ হলে ঠাকুর তাঁদের নিয়ে শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও কালীমন্দিরে যান এবং প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। চিহ্নিত পার্ষদদের ক্ষেত্রেই কেবল এরূপ হত। বিদায় নেবার সময় ঠাকুর পরমাত্মীয়ের মতো পুনরায় আসবার সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ঠাকুরের এই আত্মীয় সুলভ অকৃত্রিম ব্যবহার সত্ত্বেও নাগমশাইয়ের মনের কোণে একটু দুঃখ রয়ে গেল। ঠাকুর সেদিন তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে নাগমশাইকে প্রণামের অধিকার দেননি। দ্বিতীয় দিন নাগমশাই দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলে ঠাকুর খুশী হয়ে উঠলেন, "এসেছ, তা বেশ করেছ, আমি যে তোমাদের জন্য এতদিন হেথায় বসে আছি।" তারপর নাগমশাইকে কাছে বসিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কি? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা।" সেদিন নাগমশাইয়ের মনের দুঃখ কিছুটা প্রশমিত হয়। ঠাকুর তাঁকে তামাক সাজা, গামছা, বটুয়া আনা, গাড়ু এনে তাতে জল ভর্তি করা ইত্যাদি সেবার সুযোগ দিয়েছিলেন, তবে প্রথম দিনের মতো শ্রীচরণ স্পর্শ করতে দেননি।

তৃতীয় দিনে সে দুঃখটাও দূর হয়। ঠাকুর তাঁকে ডেকে বললেন, "ওগো, তুমি না ডাক্তারি কর – দেখ দিকি, আমার পায়ের কি হয়েছে।" ভাল করে

পরীক্ষা করে নাগমশাই বললেন, “কৈ কোথাও তো কিছু দেখছি না।” তথাপি ঠাকুর বললেন, ‘ভাল করে দেখ না, কি হয়েছে।” এবারে ভক্ত নাগ মশাইয়ের বুঝতে অসুবিধা হল না অন্তর্যামী ঠাকুর তাঁর চরণধুলি নেবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এও জানলেন যে ঠাকুর ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু স্বয়ং ভগবান।

নাগমশাই ঠাকুরের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। পরীক্ষাচ্ছলে একবার ঠাকুর নিজের শরীরটা দেখিয়ে নাগমশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “তোমার এটা কি বোধ হয়?” নাগমশাই স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন, “ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি, আপনি সেই।” কথাটি শোনামাত্র ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে শ্রীচরণ দুখানি নাগমশাই-এর বুকে তুলে দেন। সমাধিস্থ ঠাকুরের দিব্য স্পর্শে নাগমশাই এক ভিন্ন অনুভূতি রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং সর্বত্র জ্যোতির বন্যা দর্শন করতে থাকেন।

নাগমশাই ছিলেন শরণাগতির মূর্তবিগ্রহ। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু হবার পর একদিন তিনি শুনলেন ঠাকুর কোন ভক্তকে বলছেন, “দেখ ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্ম লাভ হওয়া বড় কঠিন।” তারপর ডাক্তারদের সম্পর্কে বিশেষ করে বললেন, “এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, তাহলে কি করে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হবে?” নাগমশাই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। ঠাকুরের কথা শুনে তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন – “যে বৃত্তি প্রবল অন্তরায় বলে ঠাকুর নির্দেশ করেছেন সে বৃত্তির দ্বারা অল্প বস্ত্র লাভে আমার প্রয়োজন নেই।” তারপর ওষুধের বাক্স এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত বইপত্র গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়ে ঠাকুরের উপর নির্ভর করে রইলেন। একদিন নাগমশাই ঠাকুরের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, “তাঁর উপর নির্ভর হল কই? এখনও তো নিজের চেষ্টা রয়েছে।” ঠাকুর তখন নিজের শরীর দেখিয়ে বলেছিলেন, “এখানকার টান থাকলে সব ঠিক ঠিক হয়ে যাবে।” সংসার যাত্রা সম্পর্কে আশ্বাস দিয়ে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, “গৃহেই থেকো, যেন তেন করে মোটা ভাত মোটা কাপড় চলে যাবে।”

গৃহে থেকে ধর্মলাভ সম্পর্কে নাগমশাইয়ের মনে সংশয় ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "গৃহে কিরূপে থাকা যায়? পরের দুঃখ কষ্ট দেখে কিরূপে স্থির থাকা যায়?" তখন ঠাকুর তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে জোর দিয়ে বলেছিলেন, "ওগো, আমি বলছি, মাইরি বলছি, ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোক অবাক হবে।" একই কথা ঠাকুর অন্য দিন অন্য ভাষায় বলেছিলেন, "তুমি জনকের মতো গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।" ঠাকুরের এই আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। স্বামীজী বলতেন, "নাগমশাই পূর্ববঙ্গ আলো করে বসে আছেন।" কত লোক নাগমশাইকে দেখতে যেত। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' গ্রন্থ প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মীয় দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় নাগমশাইকে দেখে বলেছিলেন, "এমন মহাপুরুষ জীবনে আর দর্শন করিনি। শাস্ত্রে বিদুরাদি মহাত্মার কথা শোনা যায়। নাগমশাইকে দেখে মনে হয় তিনি তাঁদের চেয়ে কিছুতেই কম নন। আমার মনে হয় বিদুর নাগমশায়ের দেহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছেন।"

দেহত্যাগের সময়ও নাগমশাই ঠাকুরের কৃপা উপলব্ধি করেছিলেন। পঞ্জিকা দেখে মহাযাত্রার দিন ঠিক হয়েছিল। ঠিক দুদিন আগে ঠাকুর দেখা দেন। নাগমশাই শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মশাইকে বললেনঃ ঠাকুর এসেছেন আমাকে তীর্থ দর্শন করাবেন। আপনি যে সকল তীর্থ দেখেছেন একে একে নাম করুন। চক্রবর্তী মশাই একে একে হরিদ্বার, প্রয়াগ, সাগর, কাশীধাম ও জগন্নাথধামের নাম করলেন এবং নাগমশাই ভাবস্থ হয়ে ঐ সব তীর্থের হুবহু বর্ণনা করতে লাগলেন। মনে হল তিনি ঐ সকল তীর্থ সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ করছেন।

DO NOT COPY

এশিয়ার প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য –

এশিয়ার – বিশেষতঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রকৃতি ও সংস্কৃতিগত ঐক্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। গ্রীষ্ম-প্রধান, বৃষ্টিবহুল, নদীমাতৃক, কৃষিনির্ভর, বনশ্যামল ও সমুদ্রস্পৃষ্ট এই দেশগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রার উপাদান নিহিত আছে। সহজলভ্য জীবনযাত্রার উপাদান – এশিয়ার জনজীবনে একটা "স্বল্পে সন্তুষ্টি" বোধ স্বতঃই জাগরূক রাখিয়াছে। জৈব প্রয়োজনের ভোগ্য সামগ্রী সহজলভ্য হওয়ায় প্রকৃতিই এই সকল দেশের অধিবাসীকে অতি-জৈব বস্তুর সন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আধিভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ এই সকল দেশে সহজেই হইয়াছে। ধান্য এবং গম জাতীয় সহজলভ্য খাদ্যশস্যের মুখ্য ব্যবহার এবং কার্পাস ও রেশম বস্ত্রের পরিধেয় এই সকল দেশের বৈশিষ্ট্য। প্রায় প্রতি দেশেই বহুভাষী, বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী এবং বহু গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিয়া এবং পরমতের উপর আঘাত না করিয়া দীর্ঘকাল সহাবস্থান করিয়াছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ এবং জয় পরাজয়ের সন্ধি-বিগ্রহ হইলেও সাধারণ জন-জীবনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাই।

ভারতবর্ষ ও চীন এশিয়ার দুই বিশাল দেশ –

ভারত এবং চীন দেশ দুইটি আয়তনে, লোকসংখ্যায় এবং যন্ত্রবিজ্ঞানে ও দার্শনিক চিন্তায় অন্যান্য এশীয় দেশ অপেক্ষা গুরুতর বরাবরই ছিল। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, লাওস, ভিয়েৎনাম, মালয় এবং বর্তমান ইন্দোনেশিয়া – আয়তনে ক্ষুদ্রতর – এবং ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তায়ও এই দুই দেশের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। চীন এবং ভারত উভয় দেশ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সময়ে সময়ে পরস্পরের কৃষ্টি ও ভাবের আদান প্রদান করিয়া উভয়েই সমৃদ্ধতর হইয়াছে। অতি-আধুনিক সংকীর্ণতাদুষ্ট

DO NOT COPY

ভাবনায় পরস্পরের ভাবগ্রহণকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। কোনও দেশের নিজস্ব শক্তিতে বিশ্বাস থাকিলে অপরের সদভাবগুলি গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। পরের সদভাব স্বীকরণে নিজেরই উন্নতি। এশিয়া এই পারস্পরিক আদান-প্রদানে শক্তিশালী হইয়াছে।

শ্রীবুদ্ধ এশিয়ার মিলন সেতু -

শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। শ্রীবুদ্ধের মাধ্যমেই ভারতবর্ষ নিজেকে বিশ্বের দরবারে প্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। শ্রীবুদ্ধের অধ্যাত্ম ভাবনা ভারতের পূর্ব পূর্ব সাধনারই পরিপূর্ণ রূপ। ভারতবর্ষ যাহা যুগ যুগ ধরিয়া চিন্তা করিয়া আসিয়াছে এবং যে অধ্যাত্ম সাধনাকে সর্বকালের এবং সর্বমানবের বলিয়া মনে করে, শ্রীবুদ্ধ তাহারই একটি মূর্ত্ত বিগ্রহ - একটি সর্বকালীন সার্থক জীবনচর্য্যার মডেল। তাই শ্রীবুদ্ধকে এবং এবং বৌদ্ধ ভাবনাকে সম-হৃদয় এশিয়াবাসী সহজেই গ্রহণ করিয়া আপন হইতে আপনতর করিয়া নিয়াছে। শ্রীবুদ্ধের জীবন ও দর্শনকে কেন্দ্র করিয়া এশিয়াবাসী ভারতবাসীকে এবং প্রতিবাসীকেও বিশেষভাবে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। শ্রীবুদ্ধ যতটা না প্রচারকের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছেন, তদপেক্ষা ভাবানুগ্রাহী দ্বারাই শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হইয়াছেন। ভারত হইতে স্বল্পসংখ্যক মাত্র প্রচারক কালেভদ্রে বুদ্ধ প্রচারে বিদেশে গমন করিয়াছেন। বিদেশ হইতেই অধিকতর জিজ্ঞাসু ভিক্ষু পণ্ডিত, রাজদূত বুদ্ধকে জানিবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন। বিদেশী রাজার দ্বারা আমন্ত্রিত এবং অনুরুদ্ধ হইয়াও ভিক্ষু পণ্ডিতগণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

এশিয়ার প্রতিটি দেশের সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, শিল্প, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্যে শ্রীবুদ্ধ বিরাজমান। এশিয়ার এই সকল দেশে ইসলাম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও এশিয়ার যেখানে বাহ্যতঃ মুসলমান এবং খ্রীষ্টধর্ম আচরিত - সেখানেও শ্রীবুদ্ধের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব লুপ্ত হইয়া যায় নাই। বৌদ্ধ চেতনা -এশিয়াবাসীর মিলনের একটি বিশেষ প্রেরণা।

বিংশ শতকে এশিয়ার নবজাগরণ –

এশিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশই প্রায় দুইশত বৎসর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনে এবং শোষণে পীড়িত ছিল। ভারতবর্ষ এবং চীনের মত বিশাল এবং মহান ঐতিহ্যশালী দেশও সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য জাতির দ্বারা শাসিত এবং শোষিত হইতেছিল। রাজনৈতিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে স্থল বিশেষে ছিল খ্রীষ্ট প্রচারকদের দ্বারা দুর্বল ও সরল এশিয়াবাসীর মনের উপর উৎপীড়ন।

বিংশ শতাব্দীর দুইটি মহাযুদ্ধ এশিয়াবাসীকে সাম্রাজ্যবাদীদের কবল হইতে মুক্ত করিতে সাহায্য করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতেই বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এবং এশিয়ার দেশগুলিতেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং স্বরাজের স্বপক্ষে ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে এশীয় দেশগুলি স্বয়ংশাসনের সুযোগ পাইতে লাগিল। দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে এই সকল দেশের আচার ব্যবহার এবং নৈতিক জীবনে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছিল সন্দেহ নাই, – কিন্তু স্বাধীন এশিয়া নিজের ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়।

স্বাধীন এশিয়ার নূতন রাষ্ট্র-চিন্তা –

স্বামী বিবেকানন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই নিপীড়িত এশিয়াবাসীর মহাজাগরণের একটা বিরাট সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সাধারণ কৃষক এবং শ্রমজীবিদের কেন্দ্র করিয়া এই মহাজাগরণ তিনি কল্পনানেত্রে দর্শন করিয়াছিলেন। মহাচীন হইতে এই নবজাগরণের আভাসও তিনি দিয়াছিলেন। জাপানীগণ এশিয়ার আর একটি শিল্পোন্নত, উদ্যমশীল, সুশৃঙ্খল, কর্মঠ জাতি। স্বামীজী এশিয়াবাসীকে জাপানী শিল্পপদ্ধতি ও কর্মকুশলতা গ্রহণে উপদেশ দিয়াছেন। জাপানের বৈষয়িক উন্নতির কলাকৌশলের প্রতি স্বামীজীর সপ্রশংস মনোভাব ছিল। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যুদ্ধরত জাপানীদের নিষ্ঠুর ও কঠোর মনোভাব বহু এশিয়াবাসীর অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার বস্তু হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর জাপান যুদ্ধকালীন কঠোরতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে এবং এশিয়াবাসীর বন্ধুসুলভ প্রীতিলাভের

চেষ্টা করিতেছে। মহাচীন এককভাবে নূতন একটি রাষ্ট্র গঠনে ক্রিয়াশীল। চীনের স্বল্প সময়ে বৈষয়িক উন্নতি এশিয়াবাসীকে কিছুটা বিস্মিত এবং প্রভাবিত করিতেছে সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষও নীতিগতভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিয়া, পররাষ্ট্র নীতিতে নিরপেক্ষ থাকিয়া এবং সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল রাষ্ট্র গঠনে তৎপর হইয়াছে। ভারতের বাহ্যতঃ বৈষয়িক উন্নতি এবং জনসাধারণের প্রকটতর দারিদ্র্যের চিত্র একটি ধাঁধার বস্তু হইয়াছে। অন্যান্য ছোট ছোট এশীয় দেশও যুদ্ধোত্তর যুগে স্বাধীনতা লাভের পর নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে।

বৈষয়িক উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ –

পরাধীনতার ফলশ্রুতি হিসাবে এশিয়ার দেশগুলি বৈষয়িক দিক হইতে দুর্বল এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনেকটা বিভ্রান্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পর বৈষয়িক উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। অবশ্য প্রতিটি দেশেরই নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে – এবং সেই শাসনতন্ত্রেই বৈষয়িক উন্নতির উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও কৃষ্টিগত বিষয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার নির্দেশও আছে। বৈষয়িক উন্নতির বিনিময়ে কোনো দেশই নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিতে চায় না। সংস্কৃতি এবং ধর্মের স্থান বৈষয়িক উন্নতির ঊর্দ্ধে। এই আত্মসচেতনতা যে দেশের আছে সেই দেশের অবশ্যই উন্নতি হইবে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশই বৈষয়িক উন্নতিতে পশ্চাৎপদ। কিন্তু তাহাদের নৈতিক বলের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহাদের মর্য্যাদা আছে। এই নৈতিক সম্পদই এশিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং বৈষয়িক ব্যাপারে অনুন্নত দেশগুলির যথার্থ শক্তি।

বৈষয়িক উন্নতির সাহায্যের বিনিময়ে কোনও দেশেরই স্বকীয় নীতিবোধের ও সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন করা সমীচীন নহে। ইহা আত্মহত্যারই নামান্তর। বৈষয়িক ব্যাপারে উন্নত, অথচ পরস্পর যুদ্ধভয়ে ভীত এবং বিবাদমান পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির প্রতি আমাদের বিচারমূলক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এশিয়ার নবজাগরণে আমরা কি বৈষয়িক উন্নতির জন্য শুধু হৃদয়হীন মনুষ্যত্ববর্জিত যন্ত্রদানবের

আরাধনা করিব? উন্নতিকামী এশিয়াবাসীর নবজাগরণের সন্ধিক্ষণে ইহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবনার সমন্বয় –

প্রাচ্যের জাপান এবং পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত জাতিগুলির রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নতির উত্থান-পতনে দ্বন্দ্ব-সংস্কার, জয়-পরাজয়ের ইতিহাস হইতে এশিয়াবাসীকে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক দেশের বৈষয়িক উন্নতির পদ্ধতি সেই সেই দেশের জলবায়ু, জনমানসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করিতে হইবে। যে কোন উন্নত দেশের যন্ত্রকৌশল যে কোনও দেশে প্রয়োগ করা যায় না – বা যে কোনও দেশের পক্ষে হিতকরও হয় না। কৃষিভিত্তিক, গ্রামকেন্দ্রিক সরল সহজ জীবনযাত্রাকে বৈষয়িক উন্নতির যন্ত্রের চাপে যেন নষ্ট না করা হয়। বৈষয়িক উন্নতি যেন সরল সহজ মানুষটির মনুষ্যোচিত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া না দেয়।

এশিয়ার জনমানসের প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত এবং বৌদ্ধ ভাবনা দ্বারা পুষ্ট যে জীবন দর্শন শান্তি ও তৃপ্তির হেতুস্বরূপ দীর্ঘকাল বিরাজিত ছিল, তাহা যেন নূতন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায়। নতুবা শুধুমাত্র যন্ত্র ও বিজ্ঞানের পূজা করিয়া আমরা অশান্তি ও বিনষ্টির পথেই অগ্রসর হইব। বৈষয়িক উন্নতির পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াবাসীর বিশ্বশান্তির এবং সহাবস্থানের নীতির ভাবনাও অবশ্য করণীয়।

বৌদ্ধ ভাবনাই এশিয়ার নৈতিক শক্তি –

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের ত্যাগ, মৈত্রী ও পরার্থপরতার আদর্শই পৃথিবীর নৈতিক শক্তি। এশিয়াবাসীর জীবন দর্শনের ত্যাগ মৈত্রী ও প্রেমের আদর্শকে বর্জন করিয়া কোনও দেশেরই বৈষয়িক উন্নতি ফলপ্রসূ হইতে পারেনা। শ্রীবুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়াই এশিয়াবাসী পঞ্চশীলে এবং সহযোগিতা ও সহাবস্থানের নীতিতে অকপট বিশ্বাসী। দেশের আভ্যন্তরীন উন্নতির পরিকল্পনায়, সাম্যবাদের ও সমাজতন্ত্রের

DO NOT COPY

প্রতিষ্ঠায় এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রচেষ্টায় শ্রীবুদ্ধের মৈত্রী ও প্রেমের ভাবনা অপরিহার্য্য। এশিয়ার অধিকাংশ দেশই বৈষয়িক দিক হইতে অনগ্রসর। কিন্তু ইহারা নৈতিক বলে বলীয়ান। এই নৈতিক বলের উৎস শ্রীবুদ্ধ। বৈষয়িক শক্তিতে শক্তিমান জাতিবর্গ নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন বলিয়াই পরস্পর যুদ্ধভয়ে ভীত। ইহারা এশিয়ার নৈতিক শক্তির সহায়তা সর্বদা প্রার্থনা করে। বাহ্য সম্পদে দুর্বল এশিয়াবাসী নিজেদের অধ্যাত্ম শক্তিতে বিশ্বাসী হইলে নিজেদের এবং বিশ্বের উপকার হইবে।

বৌদ্ধ-আদর্শের শরণাগতিই একমাত্র পন্থা-

আনন্দের বিষয় নূতন রাষ্ট্রনীতিতে এশিয়ার অধিকাংশ দেশই শ্রীবুদ্ধের আদর্শকে বিস্মৃত হয় নাই। ভারতের জাতীয় পতাকা এবং সীলমোহর শ্রীবুদ্ধের প্রতীকে লাঞ্ছিত। ভারতের বৈদেশিক নীতিতে শ্রীবুদ্ধের পঞ্চশীল স্পষ্টভাবে উচ্চারিত।

শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, লাওস ও থাইল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রধর্ম রূপেই স্বীকৃত। চীনে শ্রীবুদ্ধের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ নববিধানে স্বীকৃত এবং আচরিত। জনকল্যানে শ্রীবুদ্ধের আদর্শকে চীন প্রয়োগ করিতেছে। জাপান বৌদ্ধ ভাবনাকে আত্মসাৎ করিয়াই নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও সগর্বে উন্নতির পথে চলিয়াছে। কোরিয়া ও মঙ্গোলীয়ার জন-জীবনে শ্রীবুদ্ধের সাম্য ও মৈত্রীর ভাবনা সুস্পষ্ট।

এশিয়াবাসী ইচ্ছা করিলেও শ্রীবুদ্ধকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আর সজ্ঞানে বৌদ্ধ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারিলে শত দৈন্যের মধ্যেও শক্তি সাহস এবং সাত্বিক মনোবল লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিবে।

DO NOT COPY

পওহারী বাবার অলৌকিকত্ব **ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য**

পওহারী বাবা ছিলেন উত্তর ভারতের একজন নামকরা যোগী পুরুষ। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। আচারী বৈষ্ণব শ্রেণীর রামানুজীয় সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন পওহারী বাবা। এই সম্প্রদায় আবার দু' দলে বিভক্ত-'বড়গল' ও 'তুইঙ্খল'। পওহারী বাবা ছিলেন 'বড়গল', তিনি ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তিনি নিজে কখনো ধর্মমত প্রকাশ করতেন না। তবে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, পূর্ব জন্মের সুকৃতি অনুসারে ও ঈশ্বর কৃপায় জীব সকল বর্ণ এবং আশ্রম প্রাপ্ত হয়ে আপনার ধর্মে নানা প্রকার সদনুষ্ঠান করে সম্পূর্ণরূপে অন্তরের মলিনতা ধৌত করেন। তখন সেই বিশুদ্ধ অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্ঠা ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হলে সংসার কালিমা ধৌত হয়ে যায় অর্থাৎ মায়া ভ্রম আসক্তি বিদূরিত হয়ে ধর্ম সাধনের পবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে অনুভব করে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। গৃহী ব্যক্তি সর্বদা দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ অতিথি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করে মুক্তিলাভ করেন।

পওহারী বাবার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল প্রচুর। তাঁর দিব্যশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে উদগ্রীব হন। সত্যি পওহারী বাবা ছিলেন অলৌকিক বিভূতির অধিকারী। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন, ".....তাঁহার গমন এত দ্রুত ছিল যে, কেহ প্রাণপণ করিয়া ছুটিয়া চলিলেও তাঁহার সঙ্গ লইতে পারিত না কখনও। তিনি সহজ পথে যেখানে পথিকেরা চলে সে পথ দিয়া চলিতেন না, খানা ডোবা পার হইয়া কাঁটা খোঁচা দলিয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেন, যাইবার পূর্বেই সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিতেন, কাল কোন স্থানে আপনারা বিশ্রাম করিবেন? দাস জানিতে পারিলে সময়ে উপস্থিত থাকিবে। সঙ্গীরা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া বলিলে তিনি অবিলম্বে প্রস্থান করিতেন।

সঙ্গীরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেখিতেন পওহারী বাবা বহু পুর্বেই সেখানে গিয়া উনান পাতিয়া স্থান লেপন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা যাইবামাত্র

মুখে বস্ত্রখন্ড বাঁধিয়া ডাল ভাত রুটি প্রস্তুত করিয়া সঙ্গীগণকে ভোজন করাইতেন। তাঁহাদের ভোজনান্তে নিজে স্নান করিয়া তিন চারিটি বিল্বপত্র বাটিয়া খাইতেন, এবং কিঞ্চিৎ ঘৃত উষ্ণ করিয়া কোন দ্রব্য সংযোগে পান করিতেন, উক্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ দ্রব্য বিশেষ পিরণার পাহাড় হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়া আনেন।...পরে পুনরায় সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে বাবাগণ আবার কোন স্থানে বিশ্রাম করিবেন? তাহা হইলে সময়ে দাস উপস্থিত হইবে। আবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্বানুযায়িক সকল কার্য সমাধা করিয়া বসিয়া থাকিতেন।"

পওহারী বাবা নিজেকে দাস বলে পরিচয় দিতেন। একবার এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বহুদিন যাবৎ তিনি সূর্যালোকবিহীন ও নির্বাত জায়গায় ছিলেন বলে তাঁর শরীর ফুলের মত কোমল ও তুষারের মত সাদা হয়ে যায়।

ত্রিবেণী তীরে সামান্য পর্ণ কুটীরে কিছুদিন থেকে প্রখর সূর্যকিরণের উত্তাপে ও তীব্র হিমে, বায়ু স্পর্শে তাঁর শরীরের চামড়া উঠে যেতে লাগলো। আর সর্দিকাশি বুকে বসে এমন স্বরভঙ্গ হয়ে গেল যে তাঁর কথা বলবার শক্তি রইলো না।

প্রতিদিন তাঁর জ্বর হতে লাগলো। দেহের চামড়া উঠে যাওয়া ও জ্বরের জন্যে তাঁর অঙ্গ লাল বর্ণের হয়ে উঠলো।

তখন তাঁর আশ্রম পাশে বসবাসকারী কতকগুলি পরিচিত দীন ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ওষুধ সেবনের জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। পওহারী বাবা তাঁদের কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণদের বারংবার অনুরোধ উপরোধের কথা শুনে তিনি একসময় তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কৈ আপনারা আমাকে কি ঔষধ খেতে দেবেন দিন।

তখন ব্রাহ্মণেরা মিছরি মরিচ, মনেক্কা প্রভৃতির একটু ক্বাথ একটা ছোট ভাণ্ডে করে এনে উপস্থিত করলেন। তখন আবার তিনি বললেন, আপনারা কি কেবল ওষুধই দাসকে দেবেন? পথ্য দেবেন না?

একথা শুনে ব্রাহ্মণেরা অতি আনন্দিত মনে সকলে মিলে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে উৎকৃষ্ট পেঁড়া ও বরফি প্রভৃতি মিষ্টি এনে উপস্থিত করলেন।

ভক্ত ব্রাহ্মণরা পওহারী বাবাকে ঐসব জিনিস দেবার পর পরম আহ্লাদিত হলেন। কেননা, এ যাবৎ পওহারী বাবা সামান্য দুধ ও বেলপাতা ছাড়া কিছু খেতেন না। আজ তিনি নিজে যখন খেতে চেয়েছেন তখন ভক্তদের মনে আনন্দ হবার কথা।

পওহারী বাবা যত্নের সঙ্গে একখানি কাপড়ের টুকরোয় সমস্ত মিষ্টিগুলি বেঁধে এবং ভাঁড় শুদ্ধ ওষুধ নিয়ে চললেন। সেই সময় সন্ধ্যে আগতপ্রায়। কিন্তু কয়েকজন ব্রাহ্মণ পিছন থেকে অলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গ নিলেন।

কিছুদূর যাবার পর তাঁরা দেখলেন, পওহারী বাবা এক নির্জন জায়গায় এসে সমস্ত মিষ্টি ও ওষুধ গঙ্গা জলে ফেলে দিয়ে কাপড়ের টুকরোটি ধুয়ে তাড়াতাড়ি একদিকে চলে গেলেন।

তাই দেখার পর ব্রাহ্মণদের মনে ক্রোধের সীমা রইলো না। তাঁরা মনে মনে বাবার ওপর রাগ করলেন। মনে মনে গজরাতে লাগলেন, পওহারী বাবা যদি ওষুধ না খাবেন তবে ওসব কেন নিলেন? কেবল গরীবদের পয়সা নষ্ট করালেন মাত্র। এমন করে পয়সা নষ্ট করানোর তাঁর কি দরকার ছিল? ওষুধ খাবো না বললেই তো চুকে যেত। যাহোক, তিনি যখন কাল সকালে কুটীরে ফিরে আসবেন তখন এই জন্যে তাঁকে খুব দশ কথা আমরা শুনিয়ে দেবো। ব্রাহ্মণেরা সকলে এরূপ বলাবলি করতে লাগলেন। পরদিন সকালে পওহারীবাবা কুটিরে আসামাত্র ব্রাহ্মণেরা সকলে তাঁকে অনুযোগ করতে লাগলেন, তুমি যদি না খাবে তবে গ্রহণ করলে কেন? কেবল বৃথা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করালে। এমনিভাবে নানাপ্রকার উষ্মাপূর্ণ কথা শোনালেন ব্রাহ্মণেরা পওহারী বাবাকে উদ্দেশ্য করে।

তখন পওহারীবাবা জোড়হস্তে বিনীতভাবে বলতে লাগলেন, বাবাসকল কেন এ দাসের প্রতি বিমুখ হয়েছেন? দাস কোন অপরাধ তো করে নি। ওষুধ পথ্য যা রোগের জন্যে দিয়েছিলেন তা দাস রোগকে দিয়েছে। দেখুন আর দাসের রোগ নেই। পওহারী বাবার কথা শুনে বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণগণ। দেখলেন, বাস্তবিকই পওহারী বাবার স্বরভঙ্গ সেরে গেছে। দেহে জ্বরেরও লক্ষণ নেই।

DO NOT COPY

পওহারী বাবার আশ্রমে যাতায়াত করতেন নানা প্রকারের সাধু সন্ত। একবার এলেন একজন উন্মাদ রোগী। তখন পওহারী বাবা আশ্রমকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করে কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ঠিক এই সময় ঐ উন্মাদ লোকটি বাবাজীকে উদ্দেশ্য করে কটুকাটব্য উচ্চারণ করে। এমনকি একখানা কাঠ তুলে নিয়ে বাবাজীকে প্রহার করতেও উদ্যত হয়। তাই দেখে উপস্থিত ব্যক্তিরা ঐ উন্মাদ রোগীকে আশ্রম হতে বের করে দিতে উদ্যত হলেন। তাই দেখে বাবাজী বলে উঠলেন, না, না। ওঁকে মেরো না। ওঁকে ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো। উনি উন্মাদ নন। উনি একজন ছদ্মবেশী সাধক।

বাবাজীর কথামত তারা উন্মাদকে না মেরে শান্তভাবে তার হাত ধরে বাবাজীর সামনে উপস্থিত করলেন। পওহারীবাবা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চোখের ওপর দৃষ্টি রাখলেন। তখন সে অতি শান্তভাব ধারণ করলো। তার উন্মত্ততা দূর হলো। পরে সে বাবাজীর আশ্রমে রয়ে গেল। এভাবে বাবাজীর অলৌকিক বিভূতির গুণে একজন পাগলও প্রকৃতিস্থ হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে আর একটি ঘটনা ঘটে। পওহারীবাবার দীক্ষাগুরু থাকতেন অযোধ্যায়। তাঁদেরই আশ্রমের একজন সামান্য লোক সন্ন্যাস ভেকধরে পওহারীবাবার আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। কিছুদিন যাবৎ বাবাজীর আশ্রমে অবস্থান করে।

যে সব সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রমে দু'চার দিন বা দু'এক মাস থাকতে ইচ্ছা করতেন পওহারীবাবা নিজের পিতৃব্যের মন্ত্রশিষ্যকে অনুরোধ করে তাঁর গৃহসংলগ্ন ভূমিতে কতকগুলি পর্ণকুটির তৈরী করিয়েছিলেন, - দিনে আশ্রমে থেকে অতিথিরা সেই সব পর্ণ কুটিরে রাত কাটাতেন।

পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী আশ্রমে এসে উপদ্রব শুরু করে দিলেন! বললেন, আমার আফিমের নেশা আছে। সেই সঙ্গে প্রচুর মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাসও আছে। সন্ন্যাসীর আদেশমত পরে সকল জিনিষ এলো।

এরপর উক্ত সন্ন্যাসী পওহারীবাবার কাছে আর এক আবদার করে বসলেন। তিনি বাবাজীকে বললেন, আমি তীর্থভ্রমণে যাবো। এর জন্যে প্রচুর টাকার দরকার। আপনি সে টাকা সংগ্রহ করে আনুন।

পওহারীবাবা শিষ্যদের গ্রাম-গ্রামান্তরে পাঠালেন সেই টাকা সংগ্রহের জন্যে। কিন্তু প্রয়োজনমত অর্থ মিললো না। কেবলমাত্র এক থান কাপড় পাওয়া গেল। তাই দেখেশুনে সন্ন্যাসী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন।

একদিন পওহারীবাবাকে নির্জনে পেয়ে বলতে লাগলেন সাধারণে তোমার প্রতি যখন এত ভক্তিমান, এবং এই আশ্রম ও সদাব্রত যদি সকলই তোমার তবে নিশ্চয়ই তোমার কাছে বহু অর্থ রাশি সঞ্চিত আছে।

উত্তরে পওহারীবাবা বললেন, দাসের কোন অর্থসম্পত্তি নেই। থাকলে এখনি তা সমর্পণ করতুম। কিন্তু সন্ন্যাসীর আদৌ বিশ্বাস হল না। তিনি বললেন, যদি অর্থসম্পত্তি কিছুই নেই তবে তোমার ঠাকুরের অঙ্গে এত অলঙ্কার কোথা হতে এলো?

পওহারীবাবা বললেন, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে ঠাকুরের অলঙ্কার আপনি গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সন্ন্যাসী সেই সব সামান্য মূল্যের অলঙ্কার গ্রহণে রাজী হলেন না। বললেন, যদি তোমার অর্থসম্পত্তিই নেই তবে বৃথা কেন এ আশ্রমকুটিরে বসে আছ?

তখন পওহারীবাবা বলতে লাগলেন, তবে দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়? সন্ন্যাসী বললেন, অর্থসম্পত্তিহীনের আড়ম্বরের দরকার নেই। তুমি এখান থেকে চলে যাও। পরদিন সকালে আশ্রমে এসে সকলে দেখলো, কুটিরের দ্বারে তালা বন্ধ! তার কাছেই চাবি পড়ে রয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে রটে গেল, পওহারী বাবা আশ্রমে নেই। তাই শুনে গ্রাম-গ্রামান্তর হতে বহু লোক আশ্রমে এসে জড়ো হলো। তারা হাহাকার করতে লাগলো। কেউ কেউ আবার পওহারী বাবার খোঁজে এদিক সেদিক যেতে লাগলো।

কেউ কেউ আবার বলতে লাগলো, কেন পওহারী বাবা আশ্রম ত্যাগ করেছেন? আমরা কোন অপরাধে অপরাধী হয়েছি? সকলে এই বলে বিলাপ ও পরিতাপ করতে লাগলো। এমন সময় কয়েকজন বললে, যে সন্ন্যাসী কিছুদিন হতে আশ্রমে রয়েছে সেতো কিছু তাঁকে বলে নি?

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী গ্রামবাসীদের হাতে মার খাবার ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল।

এরপর বহু লোক ও ভক্ত পওহারী বাবার সন্ধানে চারদিকে চলে গেল। কিন্তু কেউ-ই তাঁর সন্ধান পেল না। ওদিকে পওহারীবাবা আশ্রম ত্যাগ করে জগন্নাথদেবের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথের মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুর গ্রামে তাঁকে পীড়িত অবস্থায় অবস্থান করতে হয়। এখানে একজন ভদ্র ও সাধুহৃদয় বাঙ্গালী পওহারীবাবাকে সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তোলেন। নদীর তীরে একটি কুটির তৈরী করে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

সেই কুটিরে থেকে পওহারীবাবা সাধন ভজন করতেন। এই সময় তিনি বাংলা ভাষা শেখেন এবং ঐ ভাষায় লেখা 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রমুখ কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আনন্দিত হন।

প্রায় এক বছর বাদে বহু অনুসন্ধানের পর আজিমগড়ের পণ্ডিত রামাচারীজী ব্রহ্মপুরে গিয়ে তাঁকে পূর্বের আশ্রমে ফিরিয়ে আনেন।

DO NOT COPY

রোগান্তর কল্পে **সুনন্দন ঘোষ**

সে এক শূন্যতার কাল এসেছিলো .....
বন্ধ ছিল পরভূম থেকে ঘরে ফিরে আসার অধিকার।
দরজায় দরজায় মৃত্যুর কড়া নাড়া .....
প্রতিদিন একটু একটু করে মরে যাচ্ছিলাম সবাই।

সংযমে ক্লান্ত দুটো বছর।
ভেবেছিলাম বেঁচে থাকার অর্থ বুঝেছি সবাই।
কিন্তু যখন আবার দরজা খুললো, চাকা গড়ালো,
সবাই সব ভুলে বেরিয়ে পড়লাম
বাকী থাকা জীবনটার বেহিসাবি খরচ করতে .....

আদিত্যের সংক্রমণ রাশিচক্রে,
চেতনার সংক্রমণ ষট্‌চক্রে,
অনুজীবের সংক্রমণ অবিরাম
কালনাগিনীর মত
লখীন্দরের লোহার বাসরের ছিদ্র খুঁজে।

ফিরে ফিরে আসবে মাস্ক, স্যানিটাইজার, লকডাউন,
আসবে প্রতিষেধকের নামে ব্যাভিচার।

বৈশালীর লিচ্ছবীরা 'রোগান্তর কল্পে'
ভয় থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন বুদ্ধের ছায়ায়।
সেই ছায়া দীর্ঘতর হোক আজ।
'শূন্য কল্পে' বোধিসত্ব উদ্বোধিত হোন অমৃত মানসে।

DO NOT COPY